# প্রচেষ্টা বার্তা

পৃথিবীটা আমারও, স্বাভাবিক
জীবন প্রাপ্তি আমার অধিকার।

মার্চ, ২০২১

Prochesta
a community Development Centre

পৃষ্ঠা নং ০১

# প্রচেষ্টা বার্তা

মার্চ, ২০২১

## প্রচ্ছদ

**মোঃ মশিউর রহমান,**
প্রকল্প সমন্বয়কারী,
ডিজএ্যাবিটি ইনক্লুশন থ্রু মিউচুয়াল লানিং প্রজেক্ট,
প্রচেষ্টা।

## পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়

**আলী নকী খান,**
নির্বাহী পরিচালক,
প্রচেষ্টা।

## গ্রন্থণা ও সম্পাদনায়

**মোঃ মশিউর রহমান,**
প্রকল্প সমন্বয়কারী,
ডিজএ্যাবিটি ইনক্লুশন থ্রু মিউচুয়াল লানিং প্রজেক্ট,
প্রচেষ্টা।

## ছবি সংগ্রহ ও প্রক্ষেপন

**মুক্তা রানী দেব,**
কর্মসূচী সমন্বয়কারী,
প্রচেষ্টা।

## সার্বিক সহযোগিতায়

**মোঃ আব্দুল ওহাব,**
প্রকল্প সমন্বয়কারী,
আলোয়-আলো প্রকল্প, প্রচেষ্টা।
**মোঃ নূরুল আমিন,**
হিসাব কর্মকর্তা, প্রচেষ্টা।
**মোঃ শাজাহান আলী,**
পিএইচআরপিবিডি প্রকল্প, প্রচেষ্টা।
**সুজিত বড়াইক,**
পিএইচআরপিবিডি প্রকল্প, প্রচেষ্টা।
**পূর্ণিমা অলমিক,**
পিএইচআরপিবিডি প্রকল্প, প্রচেষ্টা।

বিষয়বস্তু

# ভিতর


০৩ ভূমিকা

০৪ উন্নয়ন ও প্রতিবন্ধকতা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

০৭ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষায় মিডিয়ার ভূমিকা

১০ প্রভাতী কুমারের জীবনের পরিবর্তন

১২ শিক্ষা ও আমাদের সংস্কৃতি

১৪ চা বাগান জনগোষ্ঠির শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি এবং কিশোর-কিশোরী ও নারীর ক্ষমতায়ন

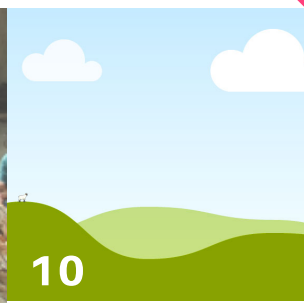

Prochesta
a community Development Centre

Website: www.prochestabd.org.bd
Email: pro.moulvibazar@gmail.com
Facebook page: https://www.facebook.com/prochestabd.org.bd
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsI2tGJYBzmU44Ho66oqu-g
Cell: (+88) 01713-80 76 17

# ভূমিকা

# উন্নয়ন ও প্রতিবন্ধকতা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

**মো: মশিউর রহমান**

উন্নয়ন চিন্তায় সমাজের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক জীব হিসেবে প্রতিটি মানুষের সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখা ও এদত:সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুযোগ প্রদান করা অত্যাবশকীয়। আদিম সমাজের প্রতিচ্ছবিতে এটা আমাদের কাছে দর্শনীয় যে সুযোগ দান অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতি প্রদত্ত তথাকথিত দূর্বলতাকে অত্যন্ত সুচারুরূপে কাজে লাগানো যায়। বর্তমান যুগে আধুনিক কৃষিতে নারীদের অংশগ্রহণ অপেক্ষাকৃত কম হলেও আদিম সমাজের কৃষিতে নারীরাই ছিল বৈতরনী।

"মানুষের প্রতি অবহেলা, বৈষম্য, দূর্বল ভাবনা, সম্পদের অসম বন্টন, দমিয়ে রাখার বাসনা, সুযোগ হতে বঞ্চিত করা বা সুযোগ না দেয়া আমাদের সমাজকে সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে দিচ্ছে।"

নারীকেন্দ্রিক/তান্ত্রিক সমাজের মুখোপাত্র হিসেবে সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনের মতই কৃষি কাজে অংশগ্রহণ ছিল তাদের জন্য অন্যতম প্রধান কাজ। বর্তমান আধুনিক সমাজে নানাবিধ উন্নয়ন সূচকে অগ্রগতি থাকলেও পশ্চাতে সামাজিক অবক্ষয় ও অবমূল্যায়ন এ সকল উন্নয়ন সূচককে বাধাগ্রস্থ করে থাকে। পূর্বে বিভিন্ন কুসংস্থার যেমন সামাজিক বৈষম্য ও উন্নয়ন চিন্তাকে আবিষ্ট করে শোষন বঞ্চনার এক একটি অধ্যায় রচিত করতো ঠিক তেমনি উল্লেখিত কুসংস্থারের স্থলে মানুষের প্রতি অবহেলা, বৈষম্য, দূর্বল ভাবনা, সম্পদের অসম বন্টন, দমিয়ে রাখার বাসনা, সুযোগ হতে বঞ্চিত করা বা সুযোগ না দেয়া আমাদের সমাজকে সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে দিচ্ছে।

এতো গেল আমাদের মত তথাকথিত সুস্থ সবল মানুষের কথা। এখানে তথাকথিত সুস্থ বলছি এজন্য যে, আমরা আমাদের চিন্তা ও মননে পুরোপুরি সুস্থ নয়। আমরা পারছি না আমাদের সমাজের পিছিয়ে পড়া, অবহেলিত, প্রতিবন্ধি মানুষগুলোকে আমাদের সাধ্যেও মধ্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাগুলোতে প্রবেশগম্যতা দিতে। পক্ষান্তরে সকলেই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছি। এ চলা যে, আমাদের সমাজবোধ ও আধুনিক উন্নয়ন ধারার অন্তরায় তা বেমালুম ভুলে থাকি। অথচ আধুনিক সভ্যতা বির্নিমানে সকল শ্রেণি, পেশা তথা সমাজবদ্ধ সকল মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ অস্বীকার করার উপায় নেই। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সকল নাগরিকের সমান অংশ্রহণ পাবার কথা থাকলেও তা এখনও সুদুর পরাহত।

পুজিঁবাদী চিন্তা-চেতনায় সামাজিক বৈষম্য ও বঞ্চনার ইতিহাস আমাদের সকলের জানা নেই এমনটি নয়। ব্যক্তিক বস্তু লাভে আমরা এতটা মরিয়া যে আমাদের নৈতিকতার সেলগুলো অনেক আগেই মরে গেছে। মানবিকতার সত্তাহীন এক প্রাণিতে উপনীত হয়েছি। হয়েছে সামাজিক মূল্যবোধে অবক্ষয়!

আমরা যারা তথাকথিত শিক্ষিত, সভ্য ও আধুনিকতার লেবাসধারী তারা অনেক আগেই শিক্ষার, সভ্যতার ও আধুনিকতার পায়ে কুঠারাঘাত করেছি। আমাদের কাছে এটায় সমাজের প্রাপ্য ছিল যা সমাজ বির্নিমাণে সামাজিক সমতা আনয়নে প্রযোজ্য। আমরা কি কখনো এ কথা ভেবে দেখেছি যে, দেশ তথা সমাজের উন্নয়নে আমার কতটুকু আবদান রয়েছে? উত্তরটা আমার মত তথাকথিত শিক্ষিতজন সকলেরই জানা।

শিক্ষার আড়ালে আমরা নিজেদের উন্নয়নে চক্ষু সম্মুখে বিদ্যমান সুযোগগুলোকে কেবল আমারই হিসেবে দাঁড় করেছি। ফলশ্রুতিতে আমিই সামগ্রিক উন্নয়ণে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি। তবে একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, সমাজ উন্নয়নে শিক্ষিত জনরাই মূল চালিকা শক্তি। তবে প্রেক্ষিত ভিন্ন!

আমার দেশে আর্থিক অবমূল্যায়ন বা অপব্যবহার বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাৎ হয় তাতো আমার মত শিক্ষিত জনেরাই করে থাকে। এক্ষেত্রে অন্যদের সুযোগ কই? বোধ করি মানুষ হিসেবে ঐ ধরণের সুযোগের প্রয়োজনও থাকা উচিৎ নয়। নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রীয় সুযোগ প্রাপ্তির অধিকার সকলের থাকলেও স্থান ও ব্যক্তি বিশেষে আমরা তার পার্থক্য করে ফেলেছি। বলতে পারেন তা প্রতিষ্ঠিতই করে ফেলেছি। শহর এবং গ্রাম ভেদে এ বৈষম্য অনেক। অথচ জনসংখ্যার একটি বড় অংশ বসবাস করছে গ্রামীণ জনপদে।

এতো গেল আমাদের মত তথাকথিত সুস্থ সবল মানুষের কথা। এখানে তথাকথিত সুস্থ বলছি এজন্য যে, আমরা আমাদের চিন্তা ও মননে পুরোপুরি সুস্থ নয়। আমরা পারছি না আমাদের সমাজের পিছিয়ে পড়া, অবহেলিত, প্রতিবন্ধী মানুষগুলোকে আমাদের সাধ্যেও মধ্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাগুলোতে প্রবেশগম্যতা দিতে। পক্ষান্তরে সকলেই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছি। এ চলা যে, আমাদের সমাজবোধ ও আধুনিক উন্নয়ন ধারার অন্তরায় তা বেমালুম ভুলে থাকি। অথচ আধুনিক সভ্যতা বির্নিমানে সকল শ্রেণি, পেশা তথা সমাজবদ্ধ সকল মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ অস্বীকার করার উপায় নেই। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সকল নাগরিকের সমান অংশ্রহণ পাবার কথা থাকলেও তা সুদুর পরাহত।

পুজিঁবাদী চিন্তা-চেতনায় সামাজিক বৈষম্য ও বঞ্চনার ইতিহাস আমাদের সকলের জানা নেই এমনটি নয়। ব্যক্তিক বস্তু লাভে আমরা এতটা মরিয়া যে আমাদের নৈতিকতার সেলগুলো অনেক আগেই মরে গেছে। মানবিকতার সত্তাহীন এক প্রাণিতে উপনীত হয়েছি। হয়েছে সামাজিক মূল্যবোধে অবক্ষয়! আমরা যারা তথাকথিত শিক্ষিত, সভ্য ও আধুনিকতার লেবাসধারী তারা অনেক আগেই শিক্ষার, সভ্যতার ও আধুনিকতার পায়ে কুঠারাঘাত করেছি। আমাদের কাছে এটায় সমাজের প্রাপ্য ছিল যা সমাজ বির্নিমাণে সামাজিক সমতা আনয়নে প্রযোজ্য।

এতো গেল দৃশ্যমান বৈষম্য আর বঞ্চনার ধরণ। এর অগোচরে পারিবারিক পরিমন্ডলে রয়েছে অন্যধরণের বৈষম্যেও ধরণ যা দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়।

প্রতিবন্ধী শিশু মূল যে প্রতিবন্ধকতার সন্মূখীন হয় সেটা তার বৈকল্য নয়, বরং সেটা হলো ব্যাপক বৈষম্য এবং কুসংস্কার।

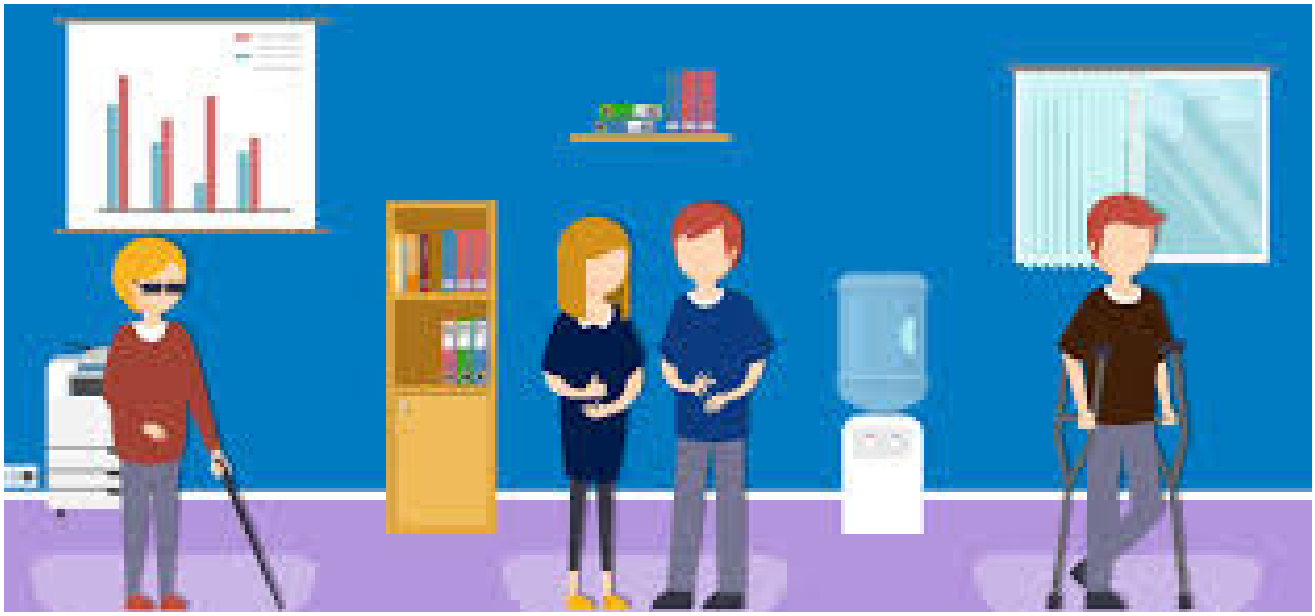

পারিবারিক পরিমন্ডলে বৈষম্য ধনী ও দরিদ্র পরিবারের ক্ষেত্রে মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য শিক্ষার উপর ভিত্তি করে বহমান করে। ছেলে-মেয়ে তথা জেন্ডার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। দরিদ্র পরিবারে এ বৈষম্য এমনকি খাবারের ক্ষেত্রেও। যেখানে প্রথাগতভাবে জেন্ডারভিত্তিক বঞ্চনার এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করেছে। এ বৈষম্য সম্পদের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রকট যা মননে গভীরভাবে গ্রথিত।

আমরা জানি বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীত্ব অন্যতম প্রধান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা। এখন পর্যন্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে প্রতিবন্ধীত্বের উপর বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। খানার আয় ও ব্যয় জরীপ ২০১০ অনুসারে, অক্ষমতার হার মোট জনগোষ্ঠির ৯.১ শতাংশ, যদিও ২০১১ সালের জাতীয় আদমশুমারী অনুযায়ী এ হার শতকরা ১.৭ শতাংশ। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান উপলব্ধি হলো এই যে, প্রতবিন্ধী শিশু মূল যে প্রতিবন্ধকতার সন্মূখীন হয় সেটা তার বৈকল্য নয়, বরং সেটা হলো ব্যাপক বৈষম্য এবং কুসংস্কার।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার লঙ্ঘনের মূলে রয়েছে পরিবার, সমাজ এবং কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সমাজের সর্বস্তরে এরূপ একটি বিশ্বাস আছে যে, প্রতিবন্ধীত্ব একটি অভিশাপ এবং এটি পাপ কাজের শাস্তি স্বরূপ, যা প্রতিবন্ধীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ যত্ন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা এবং অংশগ্রহণের সুযোগকে চরমভাবে প্রভাবিত করে।

যার ফলশ্রুতিতে, প্রতিবন্ধী শিশুরা স্বাস্থ্যসেবা অথবা বিদ্যালয়ে যাওয়ার সবচেয়ে কম সুযোগ পায়। বিশেষ করে তাদেরকে লুকিয়ে রাখলে কিংবা প্রতিষ্ঠানে দিলে অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সকল গোষ্ঠির মধ্যে তারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতন, অপব্যবহার, শোষণ এবং অবহেলার শিকার হয়। লিঙ্গও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় কারণ ছেলের তুলনায় প্রতিবন্ধী মেয়েরা কম খাদ্য ও যত্ন পায় যা খুবই দূঃখজনক।

প্রতিবন্ধী শিশুর পরিস্থিতি বিশ্লেষণে ২০১৪ সালে দেখা যায় যে, শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুরা বাংলাদেশে সবচেয়ে নাজুক অবস্থানে রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার ৯৭ শতাংশ হলেও মাত্র ১১ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিশু যে কোনো ধরনের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় যা হতাশাজনক। সুতরাং এখনই সময় সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সমতা ভিত্তিক সকল সুযোগ সৃষ্টি ও প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার।

প্রকল্প সমন্বয়কারী, প্রচেষ্টা।

# প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষায় মিডিয়ার ভূমিকা

মানব ইতিহাসের সৃষ্টি লগ্ন থেকেই এক শ্রেণির মানুষ অধিকার বঞ্চিত ও বিপরীতে আর এক শ্রেণির সামাজিক তথা মানবিক দায়িত্ববোধের শূণ্যতা থেকেই শ্রেণি বৈষম্যের ইতিহাস রচিত হয়েছে। এ নিয়ে হয়েছে বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিবাদ যা আমাদের সবারই জানা। সময়ের আবর্তনে তখন কিছু মানুষ এই বৈষম্যের প্রতিবাদে সংগঠিত হয়েছে, চেষ্টা করেছে বঞ্চিত মানুষদের অধিকারগুলো ফিরিয়ে দেবার। আছে সফলতা ও ব্যর্থতার নানা অধ্যায়। আমরা আজ একবিংশ শতাব্দীর এ সময়েও বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা, ধর্ম-বর্ণ ও জাতিভেদে বৈষম্য দেখতে পায়। এ সকল বৈষম্য দূরীকরণে বিভিন্ন আইন ও প্রথা-প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে।

আমরা বিশ্বের ১ম কল্যাণ রাষ্ট্র বা **Welfare State** হিসেবে জার্মানির নাম অনেকেই জানি। জার্মানির ১ম চ্যান্সেলর 'অটো ভন বিসমার্ক' প্রশিয়া-সাকসনিয়া প্রদেশে কল্যানমূলক কর্মসূচী প্রণয়নের মাধ্যমে কল্যান রাষ্ট্রের সুচনা করেন ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে, যা আমাদের অনেকেরই জানা। কল্যান রাষ্ট্র ধারণায় রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ রক্ষা ও প্রচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অধিকারের ক্ষেত্রে এটি একটি সুখী ও সমতা ভিত্তিক জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অক্ষমের সুযোগের সমতা দান করে, সম্পদের সমানুপাতিক বণ্টন এবং জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা রচিত করে।

পরবর্তী পর্যায়ের আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রগুলি হল- ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডস, পাশাপাশি নরডিকের দেশ যেমন- আইসল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক এবং ফিনল্যান্ড। এ সকল দেশে নাগরিকদের সর্বোচ্চ নাগরিক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রাষ্ট্র করে থাকে। তবে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে সরকারের একার পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না। তবে সরকার কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী তাদের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি অধিকার রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' ( **Millennium Development Goals - MDGs**) সম্পর্কে জানি। জাতিসংঘ ২০০০ সালে সহস্রাব্দ শীর্ষ-বৈঠকের পর প্রতিষ্ঠিত ৮টি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণে ১৯১টি সদস্য এবং কমপক্ষে ২২টি আন্তর্জাতিক সংস্থা, ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। যার সময়কাল ধরা হয় ২০০০-২০১৫ সাল পর্যন্ত।

পরবর্তী পর্যায়ে আরো সুনিদিষ্টভাবে লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (ঝউএ) নির্ধারণ করা হয় যার সম্পর্কে আমরা কম বেশি সবাই জানি। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। যার মেয়াদ ২০১৬-২০৩০ সাল। এই ১৭টি লক্ষ্য মাত্রায় ৩ নং লক্ষ্যমাত্রায় প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে সমধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া ৪ নং লক্ষ্যমাত্রায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় সরকার ২০০১ সাল থেকে প্রতিবন্ধী ভাতার প্রচলন করেছে। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৮ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক ৭৫০ টাকা হিসেবে ১৬২০ কোটি টাকা প্রদান করা হচ্ছে যা অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

বর্তমান সরকারের সময় প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা হল, বিদ্যমান বাস্তবায়ন নীতিমালা সংশোধন করে যুগোপযোগীকরণ, উপকারভোগী নির্বাচনে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্তকরণ ও ডাটাবেইজ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ১০ টাকার বিনিময়ে সকল ভাতাভোগীর নিজ নামে ব্যাংক হিসাব খুলে জিটুপি পদ্ধতিতে ভাতার অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

তাছাড়া প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৯ সালে 'জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের আওতায় ৬৪টি জেলায় ১০৩টি 'প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিনামূল্যে থেরাপী সেবা প্রদান (এ পর্যন্ত ৬৯,৯৮,৫৩৮টি) ও বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ বিতরণ (গত ৩ বছরে ৩৬৬০২টি) করা হয়েছে।

আমার দেশে আর্থিক অবমূল্যায়ন বা অপব্যবহার বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাৎ হয় তাতো আমার মত শিক্ষিত জনেরাই করে থাকে।

এ ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানের আওতায় যে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তা হল-
১. অটিজম ও এনডিডি কর্নার সেবা,
২. অটিজম রিসোর্স সেন্টার এর মাধ্যমে সেবা প্রদান,
৩. বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা,
৪. স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম কার্যক্রম পরিচালনা,
৫. ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস,
৬. কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল,
৭. অটিজম সমস্যাগ্রস্থ সন্তানদের পিতা-মাতা/ অভিভাবক ও কেয়ার গিভারদের প্রশিক্ষণ,
৮. পিতৃ-মাতৃহীন প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস,
৯. দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ,
১০. প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিভিন্ন দিবস উদযাপন ইত্যাদি।
বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সনদ ও দেশের জাতীয় আইন কাঠামোয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুনির্দিষ্ট অধিকারগুলোকে সুনিশ্চিত ও সুরক্ষিত করা হয়েছে।

ক. জাতিসংঘ ২০০৬ সালে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ে জাতিসংঘ সনদ' (**United Nations Convention on the Rights of Persons with disabilities - UNCRPD**) গ্রহণ করে এবং ২০০৭ সালে বাংলাদেশ সরকার তাতে অনুস্বাক্ষর করে।

খ. ১৬০ টির বেশি দেশ জাতিসংঘের এই সনদে (**UNCRPD**) অনুস্বাক্ষর করেছে যার ফলে এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মানবাধিকার বিষয়ে একটি বৈশ্বিক মানদন্ড লাভ করেছে।

গ. এই সনদে (**UNCRPD**) কর্মসংস্থানের অধিকার বিষয়ে বিধান রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীনভাবে পছন্দ করে এবং অন্যদের সাথে সমতা রক্ষা করে কাজ করার অধিকার থাকবে, যা হবে স্বাধীনভাবে পছন্দকৃত বা শ্রম বাজার স্বীকৃত এবং কর্মপরিবেশ হবে উন্মুক্ত, অন্তর্ভূক্ত এবং প্রবেশগম্য।

ঘ. এই সনদের ধারাবাহিকতায় - বাংলাদেশ সরকার প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের অধিকারসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে।

**প্রতিবন্ধীদের অধিকার রক্ষাকল্পে গৃহীত বাংলাদেশের জাতীয় নীতি কাঠামোয় যা রয়েছে -**

১. বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত আছে - সকল প্রকার কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এবং প্রজাতন্ত্রের সকল দপ্তরের চাকুরির ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ থাকবে।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ এর অনুচ্ছেদ-১০ এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা, ন্যায়সঙ্গত সুযোগ-সুবিধা, কোটা সুবিধাসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর-অব্যাহতির কথাও বলা হয়েছে।

৩. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ অনুযায়ী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে শতকরা ৫ ভাগ আসন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য সংরক্ষিত রাখার কথা বলা হয়েছে।

৪. বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধি ব্যক্তির অধিকার রক্ষায় 'প্রতিবন্ধি ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ (তপশিল ধারা ২ (৭) এবং বিধিমালা-২০১৫ প্রণয়ন করেছে, যেখানে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত সকল ধারা সন্নিবেশ করা হয়েছে।

**অটিজম কি?**

'অটিজম' বা 'অটিস্টিক' শব্দটার সঙ্গে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত। তবে অটিজম আসলে কি? এ ব্যাপারে খুব অল্প সংখ্যক মানুষের পরিস্কার ধারণা আছে।

এটি না জানার মূল কারণ হচ্ছে এ সংক্রান্ত তথ্য সবার কাছে পৌছানোর মাধ্যমের অভাব। অটিজম সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু ভুল ধারণা আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। গ্রামে এখনো মনে করা হয় অটিস্টিক শিশুরা ও ব্যাক্তিরা জিন বা ভুতের আছরের শিকার। কিংবা এও মনে করা হয় তারা পাগল।

অটিজম কোন রোগ, বংশগত বা মানসিক রোগ নয়, এটা স্নায়ুগত বা মানসিক সমস্যা। অটিজমকে সাধারণভাবে শিশুর মনোবিকাশগত জটিলতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অটিজমের লক্ষণগুলো একদম শৈশব থেকেই, সাধারণত তিন বছর থেকে প্রকাশ পেতে থাকে এ সমস্যা। অটিজমে আক্রান্তরা সামাজিক আচরণে দুর্বল হয়, পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কম সক্ষম হয়।

## প্রতিবন্ধী কে বা কারা?

কারা এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তা 'বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩'-এ বলা হয়েছে যে, " প্রতিবন্ধী অর্থ এমন এক ব্যক্তি যিনি জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত হয়ে বা দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বা অপচিকিৎসায় বা অন্য কোনো কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন এবং উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পুর্ণ কর্মক্ষমতাহীন এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম"।

অর্থ্যাৎ এ কথা বলা যেতে পারে, প্রতিবন্ধীতা অর্থ হল-যে কোন কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকুলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব, যার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন।

## প্রতিবন্ধীতার ধরণঃ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ অনুযায়ী প্রতিবন্ধীতার ধরণগুলো হলঃ

## আধুনিক সমাজ ও গণমাধ্যম (Mass Media)ঃ

গণমাধ্যম আধুনিক সমাজের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের উপরিকাঠামো, অবকাঠামো কিংবা মানবীয় আচরণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়নে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই মিডিয়া বা গণ মাধ্যম মানুষের তথ্য, শিক্ষা, বিনোদনসহ নানাধর্মী চাহিদাই শুধু মেটায় তা নয়। বরং গণমাধ্যম জনগণকে প্রভাবিত করে, বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করে এবং স্বপ্ন দেখায়। মানুষ তাদের জীবনযাপনের বিভিন্ন দিক নির্দেশনাও পেয়ে থাকে এখান থেকে। তাছাড়া সামাজিক জীবনের নানা সমস্যা মোকাবেলায় গণমাধ্যম সহযোগী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে থাকে। সমাজ থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র, কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও বৈষম্য দূরীকরণে মিডিয়া কাজ করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, গণমাধ্যম বিশেষ করে রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের ইতিবাচক ভূমিকা পালনের কারণে উৎপাদন বৃদ্ধি, পশুপালন, কৃষি উপকরণ ব্যবহার, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ, শিশু পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, শিক্ষা কার্যµম পরিচালনাসহ নানা বিষয়ে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

(চলমান >>>)

সম্প্রতি ইন্টারনেট মাধ্যমও রাষ্ট্রযন্ত্র ও প্রশাসনে পরিবর্তনসহ বিভিন্ন পরিবর্তন আনয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন ইস্যুতে প্রচারণা চালাতে, জনগণকে সচেতন করতে ইন্টারনেট মাধ্যমে ব্লগ, ফেসবুক, টুইটারসহ বিভিন্ন ওয়েবপেজ ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমরা কৃষি আর শিল্প যুগের আধিপত্য কাটিয়ে তথ্য প্রধান সমাজে পা দিয়েছি। এ যুগের অন্যতম নিয়ামক শক্তি হল তথ্য। তথ্য ও যোগাযোগ মাধ্যম আধুনিক মানুষের গোটা জীবন পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। আর প্রতিনিয়ত তথ্য জানানোর কাজটি করছে গণমাধ্যম। গণযোগাযোগের অন্যতম শাখা সাংবাদিকতার কল্যাণে সারাবিশ্বকে কম্পিউটার বা টিভির পর্দায় দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। ঘটনার তাৎক্ষণিক বিবরণ জানাসহ টেলিভিশন চ্যানেলে উঠে আসছে লাইভ চিত্র। সাংবাদিকতাকে তাই বলা হয় 'উইন্ডো টু দ্যা ওয়ার্ল্ড'। তবে সংবাদ মাধ্যম□□□লো শুধু ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। গণমাধ্যমের ভূমিকা শুধু সংবাদ পরিবেশন ও বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সংবাদকর্মী বা সাংবাদিকরা দেশের সাধারণ মানুষ ও রাষ্ট্রের মধ্যে মেডিয়েটর বা মাধ্য□□ম হিসেবে কাজ করে

গণমানুষের আশা-আকাঙ্খা ও চাহিদার বহিঃপ্রকাশ সাংবাদিকদের মাধ্যমে নীতি নির্ধারকদের কাছে পৌঁছায়। তারা নতুন নতুন ধারণা ও বিষয় মানুষের সামনে হাজির করে। গণমাধ্যমকর্মীরা তাই সমাজের শিক্ষক ও গাইড হিসেবেও কাজ করে। তারা সমাজের মতামত নির্মাতাও বটে। সমাজের গতিধারা ও নতুন প্রবণতাগুলোর সূত্র বিশ্লেষণ হাজির করে গণমাধ্যম। মার্কিন সাংবাদিক ওয়ালটার লিপম্যান এর মতে, 'সাংবাদিক তথা মিডিয়া-জনগণ ও নীতি নির্ধারণী এলিটদের মধ্যে মধ্যস্ততাকারী হিসেবে কাজ করে'।

## প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার রক্ষায় গণমাধ্যমের (Mass Media) ভূমিকাঃ

আমরা জানি বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীত্ব অন্যতম প্রধান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা। এখন পর্যন্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে প্রতিবন্ধীত্বের উপর বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। খানার আয় ও ব্যয় জরীপ ২০১০ অনুসারে, অক্ষমতার হার মোট জনগোষ্ঠির ৯.১ শতাংশ।

প্রতিবন্ধী শিশুর পরিস্থিতি বিশ্লেষণে ২০১৪ সালে দেখা যায় যে, শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুরা বাংলাদেশে সবচেয়ে নাজুক অবস্থানে রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার ৯৭ শতাংশ হলেও মাত্র ১১ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিশু যে কোনো ধরনের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় যা হতাশাজনক। এ ধরনের অসংখ্য সমস্যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে বিদ্যমান। সমাজে দর্পণ হিসেবে এ সকল অসংগতি/সমস্যাগুলো জনগণ ও নীতিনির্ধারকদের সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে মিডিয়া সমাজের সমতা বিধান, উন্নয়ন ধারায় সকলের অংশগ্রহণ ও সামাজিক সংহতি বিধানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মিডিয়া একটি সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে অন্যতম সহায়কের ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে মিডিয়া অংশগ্রহণ ও তার ভূমিকা সম্পর্কে জানি। সামাজিক বিভিন্ন আন্দোলন, সচেতনতা সৃষ্টি ও সংগঠিতকরণে মিডিয়ার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। মিডিয়ার কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। সুতরাং এ প্রত্যাশার জায়গা থেকেই মিডিয়াকে সমাজের এই বিরাট একটি অংশের প্রয়োজনীয় অধিকার রক্ষাপূর্বক সমতা ভিত্তিক অংশগ্রহণে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশাবাদী।

# প্রভাতী কুমারের জীবনের পরিবর্তন

চা বাগানের আলোবাতাসেএক হতদরিদ্র চা শ্রমিক পিতা দশরথ কুমার ও মাতা বিদ্যা কুমারের কোল জুড়ে আলোকিত করে জন্ম হয় প্রভাতী কুমারের। মৌলভীবাজর জেলার কমলগঞ্জ থানার কানিহাটি চা বাগানে ১৯৭৩ সালে এক অভাব অনটনের সংসারে জন্ম নেওয়া প্রভাতী কুমারের জীবন খুবই বৈচিত্রময়।

দরিদ্রতায় ঘেরা পরিবারে ৫ ভাইবোনের মাঝে সবচেয়ে বড় হলেন প্রভাতী কুমার। স্বাভাবিকভাবেই মা-বাবার আদরের ও প্রিয় মেয়ে ছিল প্রভাতী । কিন্তু বিধির বাম এই হতদরিদ্র দম্পতির আদরের প্রভাতী মাত্র তিন বছর বয়সে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েন। টাকার অভাবে প্রিয় মেয়ের চিকিৎসা করতে পারেননি বাবা-মা। যাইহোক ৭ বছর বয়সে ভর্তি হয় কানিহাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, সফলতার সাথে প্রাথমিক গন্ডি পেরিয়ে মাধ্যমিকে ভর্তি হন কানিহাটি উচ্চ বিদ্যালয়ে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গি পাল্টাতে থাকে। এমন কি সহপাটীদের কুটুক্তিও সহ্য করতে হয় প্রভাতীকে। মানুষের এসব আচরণে প্রভাতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে থাকে হায় ঈশ্বর, প্রতিবন্ধী হওয়াটা কি অভিশাপ!

সফলতার সাথে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করলেও চরম দরিদ্রতার কারণে আর পড়া লেখা হয়ে উঠেনি প্রভাতীর। মেয়ের বয়স বাড়ার সাথে সাথে মা বাবার দুঃচিন্তা বাড়তে থাকে । এই রকম প্রতিবন্ধী মেয়ে কার হাতে তুলে দিবেন? অবশেষে ১৯ বছর বয়সে হিংগাজিয়াচা বাগান, কুলাউড়া থানা, মৌলভীবাজার জেলায় এক হতদরিদ্র চা শ্রমিক গণেশ কুমারের সাথে বিয়ে হয় প্রভাতী কুমারের ।

**বর্তমান অবস্থা:** প্রভাতী কুমার ও গণেশ কুমারের ঘর আলোকিত করে জন্ম হয় ৪ জন সুস্থ ছেলে মেয়ে। টাইফয়েডের কাছে হার মানলেও জীবনের বাস্তবতার কাছে কখনও হার মানেননি আজকের প্রভাতী। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও এই সমাজেরই মানুষ, তারাও এই আলো বাতাসে বেড়ে ওঠা প্রাণী, এই বাস্তবতাকে জীবনের মূল মন্ত্র হিসাবে বুকে ধারণ করে এগিয়ে চলা আজকের প্রভাতী কুমার ।

# প্রভাতী কুমারের জীবনের পরিবর্তন >>>

**জীবনের পরিবর্তনঃ** পিএইচআরপিবিডি প্রকল্পের আওতায় 'প্রচেষ্টা' কতৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করা একটি সংস্থার মাধ্যমে সিডিডি সাভারে ২৮ দিনের নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য নির্বাচন করা হয় প্রভাতীকে। কিন্তু ঢাকা যাওয়ার বিপক্ষে ছিল বাড়ির সবাই। এই ব্যাপারে রাজি করানোর যথেষ্ট চেষ্টা করা হলেও তার স্বামী তাকে বাইরে না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল ছিল। অবশেষে সিডিআরপি নানান পরামর্শ দেওয়ার ফলে প্রভাতী'কে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রভাতী কুমার- প্রতিবন্ধী কি? কত ধরণের, অধিকার বিষয়ে, জেন্ডার, নারী ও শিশু সুরক্ষা, স্ব-সংঠন কি, স্ব-সংগঠন তৈরী করলে কি হয়, এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ করে এসে তিনি তার এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করেন এবং স্ব-সংগঠন তৈরীর জন্য অনুপ্রেরণাযোগান। তিনি বিভিন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি স্ব-সংগঠন তৈরী করেন। প্রক্ষিণের বিষয়বস্তুগুলো স্ব-সংগঠন ও এলাকার মানুষের মাঝে তুলে ধরেন। এবং নিজ এলাকায় বিভিন্ন বার্তা প্রচার করেন। স্ব-সংগঠনে মোট সদস্য ১১ জন। তারা প্রতিনিয়ত মিটিং করে। এখন তারা সভায় এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিকে দাওয়াত করে। তাদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কে জানায়। দল গঠন করার আগে এলাকার মানুষ নানান ভাষায় ব্যঙ্গ করে ডাকতো। কিন্তু এখন দলের সদস্যরা সবাই প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে বিভিন্ন সচেতনতামুলক বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারে। তাই এখন তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্মান করে।

এখন সে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানে, তাই সে নিজে ও স্ব-সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন সরকারী ও অসরকারী প্রতিষ্টানে সাথে যোগাযোগ করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া পূরণ করে এবং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের সাথে সু-সর্ম্পক গড়ে ওঠেছে।

প্রভাতী যোগাযোগেরম্যধমে সে ইউনিয়ন পরিষদের সকল কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্ভূক্তকরণে সব সময় সচেষ্ট থাকেন। তার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধী ভাতা, বয়স্কভা, বিধাব ও শিক্ষা ভাতা প্রদান করা হয়। স্ব-সংগঠন থাকার ফলে প্রতিবন্ধী শিশুদের জরিপ করে স্কুলে ভর্তি করা হয়। স্কুলের শিক্ষকদের সাথে ভালো সর্ম্পক আছে। মাঝে মাঝে সে স্কুলগুলো ফলোআপ করে । এখন সে নিজের বাড়ীতে সবজি চাষ করে, নকশি কাথা সেলাই করে এবং হাতপাখা তৈরি করে অর্থ উপাজন করে সংসার চালাই। সে যেমন আত্ম-নির্ভরশীল। তেমনি প্রতিবন্ধী নারীদের কাজের জন্য উৎসাহ যোগায় এবং তাদেরকে কর্মমূখী করে তোলার চেষ্টা করে।

প্রভাতী এখন মনে করে, সফলতার দিক দিয়ে বিচার করলে আমি দেখতে পাই, একজন নারী হিসেবে হয়তো আমি খানিকটা সফল, কিন্তু একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে বা পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্টী হিসেবে আমি আজও বেশ অসফল, কারণ এখনও অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আছে, তারা আজও তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত। সেদিনই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে যেদিন সমাজের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সকল মর্যাদা পাবে।

# শিক্ষা ও আমাদের সংস্কৃতি

শিক্ষা যদি মনন বিকাশের অন্যতম মাধ্যম হয়ে থাকে তবে আমার অভিজ্ঞতা হলো যারা শিক্ষিত তাদের বেশিরভাগেরই মানবিক বা মনুষত্ব বিকাশ বাস্তবতায় অনেক ক্ষেত্রেই প্রকাশিত নয়। জীবনের সরলতা নেই। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে গাণিতিক সূত্রে ফেলে হিসাব মেলায়। যা ব্যক্তিক জীবনে তো বটেই, পরবর্তী প্রজন্মের জীবনেও তার প্রতিফলন দেখতে চায়।

যার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে অপূর্ণতা বা সময়ানুক্রমে চক্রিক বৃদ্ধির প্রবণতা মানুষকে হতাশায় নিমজ্জিত করে। অথচ জীবনে সুখী হওয়ার জন্য অঢেল সম্পদ খুব বেশি প্রয়োজন আমি তা বোধ করি না। সামাজিক জীব হিসেবে একটি মানানসই আর্থিক সংগতি ও সামাজিক অবস্থান এবং সেই সাথে প্রয়োজনীয় শিক্ষাই যথেষ্ট। মানব জীবনে সুখ-শান্তির বিষয়টি একটি আপেক্ষিক বিষয়। সুতরাং সামাজিক শ্রেণি বিণ্যাসের জায়গা থেকে তা বলা অনেকটাই আপেক্ষিক। মানুষের সীমাহীন লোভ-লালসা ও সম্পদ লাভের বাসনা মানসিক অশান্তির উদ্রেক করে।

অন্য কথায়, শিক্ষার সাথে একটা মানাসই চাকরি! তাতো পাবারই কথা। চাকুরী হল না তো শিক্ষার কি দাম? এমন ধ্যান-ধারনা আমাদের সমাজের বলতে গেলে ৯০ ভাগ মানুষেরই। অথচ শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল মানবিক বিকাশ সাধন, সত্য ও মিথ্যাতে আলাদা করার সক্ষমতা অর্জন করা।

অন্যদিকে, আমরা যারা নিজেকে শিক্ষিত বলে দাবি করি-সুযোগের অভাবে আমরা অনেকেই নিজেকে (হয়ত) সৎ ভেবে চলেছি, হয়তবা এ সৎ বা সততার একটা সীমারেখাও আছে। অবস্থান ও অবস্থার পেক্ষিত বিবেচনায় আমরা সৎ হিসেবে সমাজ পরিমন্ডলে অবস্থান করে চলেছি। অথচ মানুষ হিসেবে মানবীয় সকল গুনাবলী তো আমাদের মাঝেই থাকার কথা। কিন্তু তার গভীরতা অনেকটাই কম। এ পশ্চাতে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। যেমন-

প্রথমত, আমাদের বেড়ে উঠা এ প্রজন্মের সামনে অনুসরণযোগ্য ও আদর্শিক কোন ব্যক্তি না থাকা।
দ্বিতীয়ত, নৈতিক শিক্ষার অভাব তথা কম সুযোগ ও সম্পদ লাভে অসম প্রতিযোগীতা।
তৃতীয়ত, শিক্ষাকে বানিজ্যিকিকরণে রূপদান ইত্যাদি।
চতূর্থত, অপসংস্কৃতির প্রভাব ইত্যাদি।
পঞ্চমত, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি।

**শিক্ষার সাথে একটা মানাসই চাকরি! তাতো পাবারই কথা। চাকুরী হল না তো শিক্ষার কি দাম?**

আমরা জানি, পশুপাখি জন্মগত ও স্বভাবগতভাবেই পশুপাখি হিসেবে বেড়ে উঠে, কিন্তু মানুষের বেলায় এ যুক্তি কাজ করে না। মানুষই একমাত্র প্রাণী যাদের **Rationality** ও **Animality** সত্তা রয়েছে। যা মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে মানবীয় গুণ সম্পন্ন হতে পারে আবার হতে পারে পাশবিক। শিক্ষার কাজ হল হৃদয়কে জাগ্রত করে মানুষকে অধিকতর সামাজিক, ন্যায়-নিষ্ঠাবান, সৎ, দায়িত্ববান ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করা। তবে তো শিক্ষার এসব উদ্দেশ্য মতে শিক্ষিত জন দ্বারা সমাজের নৈতিকতার জায়গাটা আরো সুপ্রসারিত হওয়ার কথা। প্রিয় পাঠক, আমরা নিশ্চয় এ যোগ্যতার অর্জনের কতটুকু এগিয়েছি তা সমাজ বাস্তবতায় উপলব্ধি করতে পারি। আমরা জন্মগতভাবে মানুষ সৃষ্টিকর্তার কাছে সেরা জীবের অধিকার নিয়ে এলেও তা রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণে ও বোধের জায়গায় চিন্তাশীল, ক্রিয়াশীল ও সহনশীল হতে হয়। আর এ জন্যই মানুষ কেবল তার প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না।

প্রিয় পাঠক, আপনারা নিশ্চয় অবলোকন করেছেন- সমাজের একটা শ্রেণি রয়েছে যারা শিক্ষাকে বানিজ্যে রূপ দিয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। আগামী ভবিষ্যৎকে গলাটিপে মেরে ফেলার সব আয়োজন করা হচ্ছে এখানে। শ্রেণি ভেদে অবশ্য ভাবনা ভিন্ন ভিন্ন। মধ্যবিত্তের কাছে আর্থিক দৈন্যতা ও বিত্তের মধ্যবর্তী অবস্থানের দাঁড় করিয়ে দেয়া একটি দোনাচলার অধ্যায় মাত্র।

যাই হোক, এবার আসি সংস্কৃতি প্রসঙ্গে। আপনারা নিশ্চয় জানেন, সংস্কৃতি হলো আত্মার পরিশুদ্ধি। তাই বলা হয়ে থাকে যে জাতি যত বেশি সাংস্কৃতিক, সে জাতি তত বেশি শিক্ষিত। তাই সংস্কৃতিকে এড়িয়ে যাওয়া বা অস্বীকার করার উপায় আমাদের নেই। শিক্ষা ও সংস্কৃতি এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটি খুব ঘনিষ্ঠ। সংস্কৃতির গতিশীলতার পিছনে যেমন আছে শিক্ষা, তেমনি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ করে থাকে সংস্কৃতি। আমাদের কোনো শিক্ষাই পূর্ণ হয় না যদি না তাতে সাংস্কৃতিক শিক্ষা যুক্ত হয়। তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি পরিবার ও সমাজ থেকে আমাদের সাংস্কৃতিক শিক্ষা নেয়া উচিত।

আপনাদের নিশ্চয় স্বরণ আছে, এক সময় বাংলাদেশের পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে নকলের মহোৎসব চলত। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা নকলের কালো অধ্যায় থেকে বের হয়ে এলেও বিকল্প হিসেবে পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের আগ্রাসনে ঢুকে পড়ছি যা প্রকৃত অর্থে খুবই ভয়ানক। একদিকে পরীক্ষায় পাসের হার বৃদ্ধি যেমন আমাদের আনন্দ দিচ্ছে, তেমনি পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি আমাদের আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলছে। এক পিঠে আমরা যেমন নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশের চিত্র দেখতে চাই, অপরদিকে শিক্ষা ব্যবস্থার নড়বড়ে ভিত্তি ও শিক্ষার মান নিয়ে হতাশও হই।

বোধের অবক্ষয়ের কারণে তথাকথিত শিক্ষিত নামের অশিক্ষিতের দৌরাত্ম্যের ফলে সমাজ জীবনে আজ ঘুন ধরে গেছে। তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক শিক্ষার অসম্পূর্ণতার জন্য আমরা প্রসারতার বিপরীতে ধাবিত হচ্ছি। তাই আমরা সংকীর্ণতাই বেশি দেখি, প্রসারতা, গভীরতা দেখি না। স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অহমিকা হচ্ছে এই সংকীর্ণতা; আর প্রজ্ঞাবান, মানবিক ও সহনশীলতা হলো প্রসারতার লক্ষণ। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল তোতা/ময়না পাখি হিসেবে আমাদেও সন্তানকে গড়ে তোলা না বরং যুক্তিতর্ক ও বিচার বোধসম্পন্ন মননের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজন।

**”বোধের অবক্ষয়ের কারণে তথাকথিত শিক্ষিত নামের অশিক্ষিতের দৌরাত্ম্যের ফলে সমাজ জীবনে আজ ঘুন ধরে গেছে।”**

"বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা, যুক্তিবাদ এবং তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংযোগেই তৈরি হয় আধুনিকতা, সামাজিক অগ্রগতি এবং মনুষ্যত্ববোধ।"

**মশিউর রহমান, প্রচেষ্টা।**

ধর্মীয় বিভাজনের মধ্য দিয়ে ৪৭ দেশ ভাগ হলেও প্রথম থেকেই বাঙালিদের কাছে একটি স্বাধীন সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল ছিল মৌলিক দাবির বিষয়, আর ১৯৭১-এ স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে সেই দাবি পূর্ণতা পায় বাঙালি জাতি। স্বাধীন দেশে সংস্কৃতি চর্চার পরিধিটা বিস্তৃত ও মসৃণ হয়েছে ঠিকই কিন্তু উগ্র মৌলবাদী আগ্রাসনও থেমে নেই। শুরু থেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে একটি অন্যরকম ধারা তৈরি হয় এ দেশের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে। তবে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক আন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হলেও চর্চার পরিবেশটা বিস্তৃত হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা, যুক্তিবাদ এবং তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংযোগেই তৈরি হয় আধুনিকতা, সামাজিক অগ্রগতি এবং মনুষ্যত্ববোধ। আর সাংস্কৃতিক ভিত্তি মজবুত না হলে সভ্যতা টেকে না। সামাজিক অগ্রগতি ঘটে না। পাশ্চাত্যের দেশগুলো তাই বর্তমান ডিজিটাল যুগে একটি উপযোগী সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত শক্ত অবস্থান নির্মাণের প্রয়াস চালাচ্ছে। কিন্তু তার সাংস্কৃতিক ভিত্তি কোথায়? বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদ, মূল্যবোধ এবং শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির যে সমন্বয়ের ধারাটি আছে তা মূলত প্রশ্নবিদ্ধ রয়ে গেছে।

## "আমাদের মনোজগৎ সুন্দর হলেই কেবল বিশ্বজগৎ সুন্দর হবে।"

আমরা প্রতিনিয়ত শিক্ষিত হচ্ছি, শিক্ষার হারও আশানুরূপ বেড়ে চলছে, সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে বেকারত্বের হারও। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সফলতার সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে আমরা যতোই এগিয়ে যাচ্ছি না কেন মানবিক মূল্যবোধ থেকে পিছিয়ে যাচ্ছি যা প্রকৃত অর্থে উন্নয়নকে পিছিয়ে দিচ্ছে। আমরা জানি, গত ১ দশকে বাংলাদেশ ভৌত অবকাঠামো গত ও অর্থনৈতিকভাবে বেশ উন্নতি সাধন করেছে। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধন, সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি, নৈতিক শিক্ষা, বিজাতীয় অপসংস্কৃতির আগ্রাসন, মাদকদের বিস্তার, খুন-গুম ও ধর্ষণ রোধে বোধ করি সফল হতে পারিনি। অথচ প্রকৃত উন্নয়ন তো এ সকল বিষয়েই নির্ভর করে।

আমরা আসলে যন্ত্রে আধুনিক, মন্ত্রে আদিম। আমাদের ব্যক্তি, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, অরাজকতা, দুর্নীতি কেবল আদিমতাকেই প্রমাণ করে, আধুনিকতা নয়। সুতরাং এখনই সময় শিক্ষা ও প্রযুক্তির অগ্রগতির পাশাপাশি আমাদের সাংস্কৃতিক জ্ঞান, চর্চা, অগ্রগতি এবং সমন্বয়ের বিষয়টি আমলে নেওয়ার। কেননা আমাদের মনোজগৎ সুন্দর হলেই কেবল বিশ্বজগৎ সুন্দর হবে। ধন্যবাদ।

# চা বাগান জনগোষ্ঠির শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি এবং কিশোর-কিশোরী ও নারীর ক্ষমাতায়ন

**মোঃ আব্দুল ওহাব, প্রকল্প সমন্বয়কারী,**
**আলোয়-আলো প্রকল্প, প্রচেষ্টা।**

বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির অন্যতম একটি হলো সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলার চা উপাদানের সাথে জড়িত জনগোষ্ঠি। জীবিকায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, নিরাপদ পানি, পয়নিস্কাশন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সামাজিক কুসংস্কারসহ বিভিন্ন সমস্যায় দিনাতিপাত করে চা বাগানে বসবাসরত জনগণ। তবে সরকারি অসরকারি কিছু উদ্যোগ অনেক দিন থেকেই পরিচালিত হচ্চে যা চা বাগানের আগের পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে কিছুটা উন্নত করেছে।

এরই ধারাবাহিকতায়, ২০১৯ সাল থেকে এডুকো বাংলাদেশ'র সার্বিক সহযোগিতায় ও চাইল্ড ফান্ড কোরিয়ার অর্থায়নে কমলগঞ্জ উপজেলায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, দুর্যোগ প্রশমন ও নারীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে কাজ করছে আলোয়-আলো প্রকল্প যা বাস্তবায়ন করছে প্রচেষ্ঠা নামক স্থানীয় অসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। কমলগঞ্জ উপজেলার দশটি চা বাগান যেমন- মিরতিঙ্গা, আলীনগর, কোরমা, চম্পারাই, পাত্রখোলা, দলই, মদনমোহনপুর, মাধবপুর, নুরজাহান ও ফুলবাড়ি'তে আলোয় আলো প্রকল্পটি ২০১৯ সাল থেকে কাজ করছে।

মানুষের উন্নতির জন্য যে দিকটির উন্নয়ন বেশি দরকার তা হলো শিক্ষা আর আলোয় আলো প্রকল্পটি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ কেন্দ্রসহ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনাসহ বিভিন্ন প্রকার কাজ করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত দশটি বাগানে মোট ১৮টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনা করছে প্রচেষ্টার বাস্তবায়নাধীন আলোয় আলো প্রকল্প। যার মধ্যে ৪টি পাকা বিল্ডিং স্থাপন, ৯টি বিভিন্ন ভাড়া করা কেন্দ্রে এবং আর্থ প্রকল্প থেকে পাওয়া ৫টি কেন্দ্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিশুবিকাশ কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়নিস্কাশন নিশ্চিতকরণের জন্য ৪টি নলকুপ ও ৮টি ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে। আলোয় আলো প্রকল্প শিশুবিকাশ কেন্দ্রগুলোতে শিশুর মানসিক ও শারিরিক বিকাশের জন্য বিভিন্ন আনন্দ ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে । শিশু লালন পালনের বিভিন্ন দিক বিবেচনায় নিয়ে মায়েদের জন্য রয়েছে শিক্ষামূলক উঠানবৈঠক, ডেমো সেশন ও প্রশিক্ষণ।

চা-বাগানের অর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিশুদের পুষ্টির অবস্থা আরও নাজুক। এ অবস্থার উন্নতির জন্য অভিভাবক, তাদের শিশু ও পরিবারের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক অবহিতকরণসভাসহ বৈচিত্রময় খাবার গ্রহণের মাধ্যমে শিশু পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চা শ্রমিক মায়েদের শিশুর দেখাশুনা ও যর জন্য পরিচালনা করা হচ্ছে দিবা যত্ন কেন্দ্র। এছাড়া চা বাগানের বিভিন্ন হাসপাতালে গড়ে তোলা হয়েছে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার।

নিম্ন আয়ের চা জনগোষ্ঠির নারী শ্রমিকদের জীবিকায়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করছে চাইল্ড ফান্ড কোরিয়ার ফান্ডে পরিচালিত আলোয়-আলো প্রকল্প। নারী শ্রমিকদের বসতবাড়িতে সবজি চাষে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিভিন্ন বাগানের ২৪০ জনকে সবজি চাষের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সবজি বীজ প্রদান করা হয়। প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও বীজ ব্যবহার করে অনেক নারী শ্রমিক ও ইডিসি সেন্টারের শিশুদের মায়েরা সবজি চাষ করে পরিবারের জন্য অর্থ উর্পাজন করছে। এছাড়া সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন প্রদান করে চা শ্রমিকদের জীবিকায়নকে সহজতর করেছে।

তাছাড়া কিশোর-কিশোরী ও যুবকদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের আত্ম-নির্ভরশীল ও সামাজিক দায়-দায়িত্ববোধ সম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি বাগানে একটি করে ইয়ুথ ও এডলোসেন্ট গ্রæপ গঠন করা হয়েছে। এই গ্রæপের সদস্যরা চা-বাগানের অন্যান্য কিশোর-কিশোরী ও যুবকদের বয়:সন্ধিকাল, শিশু ও শিশু অধিকার, শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, ধুমপান ও মাদকাসক্ততা, সংগঠন ও নেতৃত্বের বিকাশসহ বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনার জন্য বৈঠক পরিচালনা করছে।

শিশু অধিকার রক্ষার্থে প্রতিটি বাগানে একটি করে কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি শিশু সুরক্ষা কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় জলবায়ুর পরিবর্তনে খাপ খাইয়ে চলা ও দুর্যোগ প্রশমনের উদ্দেশ্যে চা অধ্যুষিত মানুষেদের মাঝে সচেতনতা তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও ব্যাপক প্রচারণা মাধ্যমে সচেতন করার কাজ করা হচ্ছে।
প্রচেষ্টা আলোয়-আলো প্রকল্প-এর মাধ্যমে কমলগঞ্জ উপজেলার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির কাছে এখন একটি পরিচিত নাম। কোভিড-১৯ এর ব্যাপক সংক্রমণকালে বিভিন্ন ধরণের ত্রাণ বিতরণের মাধ্যমে এই পিছিয়ে পরা মানুষদের সহযোগিতায় আসে আলোয়-আলো প্রকল্প, যা কমিউনিটিতে ব্যাপক সাড়া ফেলে। প্রকল্পটি ২০২৩ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করে পিছিয়ে পড়া চা জনগোষ্ঠির শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জীবিকায়ন, নিরাপদ পানি-পয়নিস্কাশন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা উন্নতকরণসহ দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে প্রচেষ্টা টিম নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

**কোভিড-১৯ এর ব্যাপক সংক্রমণকালে বিভিন্ন ধরণের ত্রাণ বিতরণের মাধ্যমে এই পিছিয়ে পরা মানুষদের সহযোগিতায় আসে আলোয়-আলো প্রকল্প, যা কমিউনিটিতে ব্যাপক সাড়া ফেলে।**